রাজনৈতিক চেতনার অভাব এবং জাতীয় স্বাধীনতার অস্পষ্ট ধারণা বিদ্রোহের ভিত্তি দুর্বল করেছিল। সুপ্রকাশ রায়ের মতে, বৈপ্লবিক সংগ্রাম পরিচালনার মতো আধুনিক বুর্জোয়াগোষ্ঠী ও শ্রমজীবীশ্রেণী তখন ভারতে ছিল না। ফলে বিদ্রোহীরা চালিত হয়েছিল তথাকথিত সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রধান স্তম্ভ রাজা, জমিদার, তালুকদার প্রমুখ শ্রেণি দ্বারা। এই গোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থে কৃষক শ্রেণিকে সর্বদা বিদ্রোহ থেকে দূরে রাখতে প্রয়াসী ছিলেন। **অমলেন্দু দাশগুপ্ত** *'Our First National War'* প্রবন্ধে এই মত সমর্থন করে লিখেছেন: 'ব্রিটিশের উন্নত ও শক্তিশালী অস্ত্রের প্রতিরোধ করার জন্য প্রয়োজন ছিল ব্যাপক গণ-চেতনা ও গণ-অভ্যুত্থানের। কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক নেতৃত্ব গ্রামীণ শ্রমজীবী শ্রেণিকে এই অভ্যুত্থানের সামিল করতে সাহসী হননি।

ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর পাশবিক অত্যাচার এবং কোন কোন মুঘল কর্মচারীর বিশ্বাসঘাতকতা বিদ্রোহীদের ব্যর্থতার কারণ ছিল। মহাবিদ্রোহকে দমন করার জন্য সভ্য ব্রিটিশ সরকার যে চণ্ডনীতি গ্রহণ করে, তা এক কথায় নজীরবিহীন। প্রখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ ***মার্কস*** এবং ***এঙ্গেলস*** লিখেছেন: "পাশবিক নিষ্ঠুরতার যে দৃষ্টান্ত ইংরেজ সেনা মহাবিদ্রোহ দমনে দেখিয়েছে, তা ইউরোপ বা আমেরিকার কোনো বাহিনী কদাপি দেখায়নি।" **ড. সুরেন্দ্রনাথ সেন** তাঁর ***"Eighteen Fifty Seven"*** গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, মুঘল কর্মচারী এবং বিদ্রোহীদের সাথে আপাতযুক্ত কলি খাঁ, মহম্মদ আলি (নুনেনবাব) প্রমুখ একাধিক সামরিক ব্যক্তি গোপনে ইংরেজের সাথে যোগাযোগ রাখতেন এবং বিদ্রোহীদের গোপন সংবাদ সরবরাহ করা, বিদ্রোহীদের বিচ্ছিন্ন করা ইত্যাদি কাজে লিপ্ত ছিলেন।

দেশের অভিজাত এব বুদ্ধিজীবীদের বৃহত্তর অংশ মহাবিদ্রোহের বিরোধিতা করে আন্দোলনের প্রাণশক্তিকে দুর্বল করেছিলেন। সিন্ধিয়া, হোলকার, নিজাম, বহু রাজপুত গোষ্ঠী, ভূপালের নবাব প্রমুখ বিদ্রোহ দমনের কাজে সর্বশক্তিসহ ইংরেজের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। ***লর্ড ক্ল্যাক্ল্যানিং*** স্বীকার করেছেন যে, ভারতীয় শাসকদের সমর্থন না-পেলে ইংরেজকে সত্বর তল্পিতল্পা-সহ ভারত ছাড়তে হত। বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর প্রতিবিপ্লবী মানসিকতা বিদ্রোহীদের মনোবল হ্রাস করেছিল। ***বিপিনচন্দ্র পাল*** লিখেছেন যে, সমকালীন বুদ্ধিজীবীরা বিদ্রোহীদের সাফল্য ও ইংরেজ শাসনের অবসানের মধ্যে ও প্রাক্-ব্রিটিশ অন্ধকারময় যুগের পুনরাবির্ভাবের সম্ভাবনা দেখিয়েছিলেন। দুঃখজনক এই সত্য বিপ্লবের মানসিক বন্ধ্যাত্বকে প্রকট করেছিল।

বিদ্রোহ দমনে ইংরেজের সাফল্যের একটি বড় কারণ ছিল সদ্য প্রতিষ্ঠিত টেলিগ্রাফ-ব্যবস্থার সুবিধা। **মিঃ রাসেল** (W. H. Russel) *"My Diary in India"* গ্রন্থে লিখেছেন: "ভারতে টেলিগ্রাফ-ব্যবস্থা না-থাকলে এই বিদ্রোহে (১৮৫৭ খ্রি.) প্রধান সেনাপতির যুদ্ধ পরিচালন ক্ষমতা অর্ধেক হ্রাস পেত। টেলিগ্রাফ তাঁর ডান হাতের থেকেও বেশি কার্যকর ছিল।" টেলিগ্রাফ-ব্যবস্থা বিভিন্ন অঞ্চলের অভ্যুত্থান সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহ এবং দ্রুত প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণে সরকারকে ভীষণভাবে সাহায্য করেছিল।

মহাবিদ্রোহের প্রকৃতি :

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে মহাবিদ্রোহের চরিত্র বা প্রকৃতি সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে তীব্র মতভেদ আছে। বস্তুত এ সম্পর্কে চূড়ান্ত কথা বলা কিছুটা কষ্টকর। মহাবিদ্রোহের মূল বিবরণী ও দলিল-পত্রের সাথে ইংরেজরা জড়িত ছিল। তাদের মূল্যায়নে পক্ষপাতীও থাকা অসম্ভব নয়। ভারতবাসীর আন্দোলনকে লঘু করে দেখার প্রবণতা থাকা ইংরেজ লেখকদের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক। সমকালীন কিছু বাঙালি বুদ্ধিজীবীও মহাবিদ্রোহ সম্পর্কে মতপ্রকাশ করেছেন। কিন্তু তাঁদের বক্তব্যের নিরপেক্ষতাও প্রশ্নাতীত নয়। কারণ এইসকল বুদ্ধিজীবী মহাবিদ্রোহের মধ্যে প্রাক্-ব্রিটিশ্ যুগের নৈরাজ্যময় পরিস্থিতির পুনরাবির্ভাবের সম্ভাবনা দেখিয়েছিলেন এবং বিদ্রোহের বিরোধিতা করেছিলেন। আধুনিক ভারতীয় ঐতিহাসিকদের মতে রমেশচন্দ্র মজুমদার, সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাবিদ্রোহের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে রচিত দুটি গ্রন্থে এই বিতর্কিত প্রশ্নের নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এ ছাড়া সুশোভন চন্দ্র সরকার

Scanned by CamScanner

ও শশীভূষণ চৌধুরী, বুদ্ধাংশু মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ইতিহাসবিদের মূল্যায়ন বিদ্রোহের প্রকৃতি নিরূপণে আমাদের বিশেষভাবে সাহায্য করে।

মহাবিদ্রোহের প্রকৃতি নিরূপণ করতে গিয়ে পণ্ডিতেরা একাধিক এবং অনেকাংশে পরস্পর বিরোধী মত ব্যক্ত করেছেন। কারো মতে, এটি ছিল নিছক একটি সামরিক বিদ্রোহ। ভারতীয় সিপাহীদের একাংশ আর্থিক দাবি ও পদমর্যাদা আদায়ের উদ্দেশ্যে এই অভ্যুত্থান গড়ে তুলেছিল। আবার কারো কারো মতে, ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহ নিছক একটি সামরিক অভ্যুত্থান ছিল না। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বহু অসামরিক মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। ফলে এই বিদ্রোহ একটা জাতীয় চরিত্র পেয়েছিল। কেউ কেউ একধাপ এগিয়ে মহাবিদ্রোহকে'ভারতবাসীর স্বাধীনতার প্রথম যুদ্ধ' বলে আখ্যায়িত করেছেন। অন্যদিকে কেউ কেউ এই বিদ্রোহকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে 'সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া' হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন।

মহাবিদ্রোহের অব্যবহিত পরে রচিত একটি গ্রন্থে (Notes on the Revolution North-Western Provinces of India) ***চার্লস রেইক্স*** প্রথম এই বিদ্রোহকে 'উচ্চাকাঙ্ক্ষী' ও 'লোভী সিপাহিদের বে-আইনী অভ্যুত্থান' বলে বর্ণনা করেন। বাঙালি বুদ্ধিজীবী কিশোরীচাঁদ মিত্র, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখের বক্তব্যে রেইকস্-এর মতের সমর্থন পাওয়া যায়। ***কিশোরীচাঁদ*** লিখেছেন: "এই বিদ্রোহ ছিল একান্তই সিপাহীদের অভ্যুত্থান। এই অভ্যুত্থানে গণ-আন্দোলনের কোন উপাদান ছিল না" (*"The insurrection is essentially a military insurrection, It has nothing of the popular element in it."*)। বহু ইংরেজ লেখক তীক্ষ্ণ ভাষায় মহাবিদ্রোহের সকীর্ণতা ব্যাখ্যা করেছেন। ***হোমস্*** (T. R. Holmes) এটিকে 'আধুনিক সভ্যতার সাথে মধ্যযুগীয় বর্বরতার সংঘাত' বলে অভিহিত করেছেন। কেউ কেউ এটিকে "দেশদ্রোহী ও স্বার্থান্ধ" সিপাহীদের ব্যর্থ অভ্যুত্থান বলে নিন্দা করেছেন। মারাঠী পর্যটক ***গড়সে ভাটজী***, বাঙালী বুদ্ধিজীবী ***দুর্গাদাস বন্দোপ্যাধ্যায়*** প্রমুখও মনে করেন যে, "সিপাহীরা নিজেদের স্বার্থে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিল। তাদের আন্দোলনে আদৌ জনসমর্থন ছিল না। এঁদের দৃষ্টিতে আন্দোলনকারীরা ছিল দুষ্কৃতি-মুক্তিযোদ্ধা নয়।"

অন্যদিকে ***নর্টন*** (J. B. Norton) তাঁর *'Topics for Indian Statesman'* গ্রন্থে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহকে কেবল 'সিপাহীদের অভ্যুত্থান' বলে মানতে অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে, এটি যতটা ছিল সিপাহীদের বিদ্রোহ তার থেকে বেশি ছিল সাধারণ মানুষের গণ-আন্দোলন। **উইলিয়াম কায়ে** (W. Kaye), ***ম্যালেসন*** (Malleson), ***বল*** (C. Ball) প্রমুখ বহু ইংরেজ মনে করেন যে, ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের আন্দোলনে সাধারণ মানুষ ব্যাপক সংখ্যায় অংশ নিয়েছিল এবং এটি প্রাথমিক ভাবে সিপাহিদের আন্দোলন থেকে চূড়ান্ত পর্বে গণ-বিদ্রোহের রূপ নিয়েছিল। প্রখ্যাত সমাজতান্ত্রিক কার্ল মার্কস একাধিক প্রবন্ধে **এটিকে 'ভারতবাসীর জাতীয়তাবাদী ও স্বাধীনতার যুদ্ধ' হিসেবে বর্ণনা** করেছেন। মার্কসবাদী লেখক **সুপ্রকাশ রায়, প্রমোদ সেনগুপ্ত** প্রমুখ এই আন্দোলনকে 'সামন্ততান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে কৃষকদের অভ্যুত্থান' বলে অভিহিত করেছেন। ***তলমিজ খলদুনের*** ভাষায়: 'এটি ছিল দেশীয় সামন্ততন্ত্র ও বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগঠিত কৃষক সংগ্রাম।'

মহাবিদ্রোহের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে প্রকাশিত ড. ***রমেশচন্দ্র মজুমদারের*** গ্রন্থ *"The Sepoy Mutiny and the Revolt of 1857"* এবং ড. ***সুরেন্দ্রনাথ সেনের গ্রন্থ*** *'Eighteen Fifty Seven'* এই বিতর্কে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। ড. মজুমদার মনে করেন, এটি ছিল স্বার্থান্বেষী সিপাহিদের আন্দোলন মাত্র। এখানে জনগণের ভূমিকা ছিল নীরব দর্শকের। সিপাহিরা অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির কারণে বিদ্রোহে লিপ্ত হয়েছিল। অর্থাৎ তাদের ক্ষোভ ছিল মূলত সরকারের বৈষম্যমূলক অর্থনীতির বিরুদ্ধে। ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে ততটা নয়। তাই এই আন্দোলনের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চরিত্র খোঁজার চেস্টা বৃথা। তিনি আরও বলেছেন যে, কোন কোন অঞ্চলে অসামরিক কিছু মানুষ বিদ্রোহে সামিল হয়েছিল। এরা ছিল স্থানীয় জমিদার, তালুকদার ও সামন্তশ্রেণী। সরকারি

Scanned by CamScanner

নীতির ফলে চিরাচরিত ভৌমিক অধিকারচ্যুত এই শ্রেণি অধিকার পুনরুদ্ধারের আশায় বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল। তাঁর দৃষ্টিতে এগুলি ছিল 'সিপাহি বিদ্রোহের সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া'। ড. সেন কিছুটা ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁর মতে, সূচনাপর্বে এটি ছিল একান্তভাবেই সিপাহিদের বিদ্রোহ। কিন্তু প্রধান রণাঙ্গনে অল্পবিস্তর জনসমর্থন ছিল। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই আন্দোলন একটি রাজনৈতিক চরিত্র পায়। তিনি লিখেছেন : 'যা কেবল ধর্মীয় অধিকার রক্ষার যুদ্ধ রূপে শুরু হয়েছিল, তা পরিণত হয় স্বাধীনতার যুদ্ধে' *(What began as a war of religion ended as a war of independence...")*। অবশ্য ড. সেন এ কথাও মনে করেন যে, প্রকৃত অর্থে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনমুখি হলেও তাদের কোন জাতীয় লক্ষ্য ছিল না ও জাতীয় নেতৃত্ব ছিল না; আন্দোলন ছিল বিক্ষিপ্ত, আন্দোলকারীরা ছিল বিচ্ছিন্ন।

ইংরেজ লেখকগণ জাতিপ্রেম দ্বারা চালিত হয়ে ঘটনার বিশ্লেষণ করার জন্য মহাবিদ্রোহকে নিছক সিপাহিদের আন্দোলন বলে প্রতিভাত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। অন্যদিকে প্রখ্যাত ভারতীয় ইতিহাসবিদরা জাতীয়তাবাদের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও বৈশিষ্ট্য দ্বারা বিষয়টির মূল্যায়ন করার জন্য এর মধ্যে জাতীয় আন্দোলনের উপাদান খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়েছেন। অবশ্য ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্তও আছে। উপরোক্ত আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, কিছু ইংরেজ লেখক ও কিছু ভারতীয় পণ্ডিত বিদ্রোহের স্বরূপ প্রসঙ্গে প্রায় সহমত পোষণ করে এটিকে গণ-আন্দোলন বলে স্বীকার করেছেন। বিদ্রোহের সূচনা ও অগ্রগতি বিশ্লেষণ করলে এ সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সূচনাপর্বে এই আন্দোলনের মূল নায়ক ছিলেন সিপাহিগণ। কিন্তু সিপাহিদের আন্দোলন প্রসারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে দেশের নানা অংশে বহু সাধারণ মানুষ এতে যোগদান করেন। বিদ্রোহকালীন একাধিক ব্রিটিশ আমলা বিদ্রোহে জনসাধারণের অংশগ্রহণের দিকটা উল্লেখ করেছেন এবং জনগণের ব্রিটিশ-বিরোধী ক্ষোভ দেখে বিস্মিত বোধ করেছেন। জনৈক জেলাশাসক ***মার্ক থর্নহিল,*** পুলিশ-প্রধান ***উইলিয়াম মুর, ম্যালেসন, রবার্টসন*** প্রমুখ অনেকেই ভারতবাসীর ইংরেজবিরোধী মানসিকতা ও তার বহিঃপ্রকাশ দেখে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। এমনকি বহুস্থানে সিপাহিদের কোন আন্দোলন না-হওয়া সত্ত্বেও জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিদ্রোহাত্মক কাজে লিপ্ত হয়েছিল। যেমন মুজফ্ফর নগরে, বিহার ও উত্তরপ্রদেশের বহু অঞ্চলে অসামরিক জনতা ও অধিকারচ্যুত ভূস্বামীশ্রেণী সংঘবদ্ধভাবে ব্রিটিশবিরোধী কাজে লিপ্ত হয়েছেন। তাই ***ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারও*** লিখতে বাধ্য হয়েছেন যে, 'এই অঞ্চলে সামরিক বিদ্রোহ সাধারণ অভ্যুত্থানের দিকে অগ্রসর হয়েছে।' অযোধ্যায় বিদ্রোহ যে গণভিত্তি পেয়েছিল কোম্পানি সরকার প্রকাশিত 'ঘটনাবলীর বিবরণ' (সেপ্টেম্বর ১৮৫৭ খ্রি.) নামক দলিলে তা স্বীকার করা হয়েছে। তাই ***ড. সুশোভনচন্দ্র সরকার*** মন্তব্য করেছেন : ' ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে অভ্যুত্থানে জনবিদ্রোহের রূপ নিতান্ত অস্পষ্ট ভাবা চলে না।' সুতরাং আমরা ধরে নিতে পারি যে, ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে কেবল সিপাহিদের আন্দোলন ছিল না। সাধারণ ভারতবাসী স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলনের শরিক হয়ে আন্দোলনকে বিশিষ্টতামণ্ডিত করেছিলেন।

বিশিষ্ট বিপ্লবী বিনায়ক দামোদর সাভারকর সর্বপ্রথম ১৮৫৭-র বিদ্রোহকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ইতিহাসচর্চার আওতায় নিয়ে আসেন। মারাঠি ভাষায় লিখিত এক পুস্তকে তিনি ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহকে 'ভারতের প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ' বলে মন্তব্য করেন। *'The Indian war of independence'* গ্রন্থের ইংরাজি অনুবাদ প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ইংল্যান্ডে ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে মাত্র সতের বছর বয়সে 'মিত্রমেলা' গঠনের মধ্য দিয়ে তাঁর বিপ্লবী ভাবাদর্শগত জীবনের সূচনা ঘটে। এরই নাম পাল্টে পরে হয়েছিল 'অভিনব ভারত'। লন্ডনে গিয়ে তিনি অভিনব ভারতের বাণী প্রচার করেন এবং যেখানে 'Free India Society' নামক গুপ্ত সমিতি গঠন করে বিপ্লবী সদস্যদের সমবেত করার কাজ চালান। জনৈক গবেষক 'অভিনব ভারত'কে 'নিষ্ঠাবান বিপ্লবীদের মৌল সংগঠন' (an Inner circle of dedicated revolutionaries) বলেছেন। অর্থাৎ আদ্যন্ত একজন বিপ্লবী সাভারকর ১৮৫৭-র বিদ্রোহকে 'স্বাধীনতার যুদ্ধ' নামে অভিহিত করে আলোড়ন তোলেন। সাভারকর তাঁর অভিনব ভারত সংগঠনের

Scanned by CamScanner

মাধ্যমে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহের নবজাগরিত জাতীয়তাবাদকে বাস্তব রূপ দিতে সচেস্ট ছিলেন। এই নবভারতে হিন্দু মুসলমানকে তিনি পাশাপাশি পেতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি স্বয়ং মন্তব্য করেছেন যে, শিবাজির যুগে হিন্দুদের মুসলমান বিদ্বেষ অর্থবহ হলেও এ যুগে তা অচল। বিশিস্ট মার্কসবাদী ঐতিহাসিক অধ্যাপক হীরেন মুখোপাধ্যায় লিখেছেন যে, ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত অংশগ্রহণের ঘটনা তাঁর কাছে এই বিদ্রোহকে 'স্বাধীনতার যুদ্ধ' হিসেবে প্রতিভাত করেছিল। তাঁর মতে এই আন্দোলন সম্পর্কে ব্যাপক ইতিহাস চর্চা হলেও তা ছিল আপাত ও বাহ্যিক। বিপ্লবের মূল লক্ষ্য ছিল 'স্বধর্ম ও স্বরাজ'। আন্দোলনের শ্লোগান ছিল স্বধর্মের জন্য জাগো ও স্বরাজ আয়ত্ত কর' (Rise for Swadharma and acquire Swaraj')। ইংরেজ ঐতিহাসিকদের কিছু মন্তব্য থেকে সাভারকর ১৮৫৭-র বিদ্রোহ সম্পর্কে এমনতর সিদ্ধান্ত পৌঁছেছেন। ম্যাকার্থি (Justin Macarthy) তাঁর *'History of our own times,'* 'এ মন্তব্য করেছেন যে, সিপাহিরা প্রভাতের আলোয় দীপ্যমান হয়ে যখন যমুনার তীরে পৌঁছালো, তখন তাদের সামনে সমুপস্থিত ইতিহাসের এক বিশেষ মুহূর্ত, আর ঠিক সেই মুহূর্তেই সেনাবাহিনীর বিদ্রোহ রূপান্তরিত হল একটি জাতীয় ও ধর্মযুদ্ধে ('Converted a military mutiny into a national and religious war'.) ঐতিহাসিক হোয়াইট (S. D. White) তাঁর *"Complete History of the Indian Mutiny"* গ্রন্থে (১৮৮০) বিদ্রোহে অযোধ্যায় তালুকদারদের অংশগ্রহণকে 'স্বরাজ ও স্বদেশের জন্য লড়াই' বলে মন্তব্য করেছেন। সাভারকার মহাবিদ্রোহ সম্পর্কে ইংরেজ ঐতিহাসিকদের মন্তব্যকে ভিত্তি করেই তাঁর 'স্বাধীনতার যুদ্ধ' তত্ত্ব খাড়া করেছেন। রজনীকান্ত গুপ্ত, প্রমোদ সেনগুপ্ত এবং সাম্প্রতিক কালের ইতিহাসবিদ শশিভূষণ চৌধুরী প্রমুখ সাভারকরের বক্তব্যের মধ্যে সারবত্তা খুঁজে পেলেও, বহু ভারতীয় ঐতিহাসিক, এমনকি রমেশচন্দ্র মজুমদার বা সুরেন্দ্রনাথ সেন বিদেশী লেখকদের একাংশ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সাভারকরের মতের বিরোধীতা করেছেন।[1]

আচার্য শশিভূষণ চৌধুরী তাঁর 'English Historical writings on the Indian Mutiny 1857-1859' শীর্ষক গ্রন্থে সাভারকরের বক্তব্যকে শ্রদ্ধা ও সহমর্মিতার সাথে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, ঐতিহাসিক হিসেবে সাভারকরের কিছু দুর্বলতা ছিল। তিনি চাতুর্যের সাথে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে তথ্য নির্বাচন করেছেন। এক্ষেত্রে সাভারকরের লেখার মধ্যে একটা মিশন ছিল। সেই মিশনটি হল ভারতবাসীকে এমন ভাবে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করা যাতে তাদের বুকে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে এবং মাতৃভূমির মুক্তির জন্য 'দ্বিতীয় স্বাধীনতার যুদ্ধ' শুরু করে ('... the object of which was to inspire his people with burning desire to rise again and wage a second and a successful war to liberate their motherland.')।

প্রতীকী অর্থে সিপাহি আন্দোলনকে স্বাধীনতার প্রথম যুদ্ধ বলা গেলেও, অবশ্যই আক্ষরিক অর্থে এটি স্বাধীনতার যুদ্ধ ছিল না। আন্দোলনকারীদের গোষ্ঠীগত বা বৃত্তিগত স্বার্থ তাদের আন্দোলমুখী করেছিল। বিরাট অংশের মানুষ বিশেষত রাজন্য, জমিদার, তালুকদার প্রমুখ আন্দোলনে বিমুখ ছিল অথবা আন্দোলনের বিরোধীতা করে সরকারের সাথে হাত মিলিয়ে ছিল। এই প্রসঙ্গে ড. ***রমেশচন্দ্র মজুমদারের*** মূল্যায়নটি গুরুত্বপূর্ণ। ড. মজুমদার আন্দোলনে যোগদানকারী জনতা ও নেতৃবৃন্দের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে, এই আন্দোলনকে জাতীয় সংগ্রাম বা স্বাধীনতার যুদ্ধ বলা যায় না। তাঁর মতে, তিনশ্রেণীর মানুষ এই বিদ্রোহে যুক্ত হয়েছিলেন— সিপাহি, ভূস্বামী এবং সাধারণ জনতা। সিপাহিদের আন্দোলনমুখী হওয়ার প্রধান কারণ ছিল অর্থনৈতিক সুবিধা আদায় করা। বিদ্রোহের তাৎক্ষণিক প্রেরণা এসেছিল ধর্মবিশ্বাস ভঙ্গ হবার সম্ভাবনা থেকে। অর্থাৎ সিপাহিদের মধ্যে জাতীয় স্বার্থরক্ষার কোন প্রেরণা বা বোধ ছিল না। ***দ্বিতীয়ত*** ভূস্বামীশ্রেণী অর্থাৎ জমিদার, তালুকদার, স্থানীয় রাজা, সামন্তপ্রভু প্রমুখ ইংরেজের ভূমি-সংস্কার ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে অখুশী ছিলেন। লর্ড ডালহৌসির আমলে তাদের বঞ্চনা চূড়ান্তে পৌঁছেছিল। তাই সিপাহিদের আন্দোলনকে সামনে রেখে এই শ্রেণি তাদের ভৌমিক অধিকার ও সামাজিক মর্যাদা পুনরুদ্ধারের জন্য আন্দোলমুখী হয়েছিলেন। অর্থাৎ এক্ষেত্রেও শ্রেণি-স্বার্থরক্ষার তাগিদে তাঁরা

1. *রঞ্জিত সেন ও ঋিপ্তা সেন : মহাবিদ্রোহ ও ভারতীয় উদাসীনতা (১৯৯৭) পৃ: ৭২*

Scanned by CamScanner

আন্দোলনে লিপ্ত হয়েছিলেন। কোন জাতীয় স্বার্থচিন্তা তাঁদের ছিল না। *তৃতীয়ত*, জনগণ বিদ্রোহে যুক্ত হয়েছিল ভূস্বামীশ্রেণীর দ্বারা প্ররোচিত হয়ে। অর্থাৎ সাধারণ জনতার বিদ্রোহ ছিল সিপাহি-বিদ্রোহের প্রতিক্রিয়া মাত্র— স্বতঃস্ফূর্ত নয়। বিদ্রোহের ব্যাপকতা প্রসঙ্গে ড. মজুমদারের মূল্যায়ন হল যে, ভারতের পূর্বাঞ্চল, পশ্চিমাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলে সাধারণ মানুষ বিদ্রোহে লিপ্ত হয়নি। পরন্তু বহু ভূস্বামী ও বুদ্ধিজীবী আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে সরকারের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। এঁদের বিচারে এই আন্দোলন ছিল হটকারী, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী এবং সংকীর্ণ স্বার্থপ্রণোদিত। আন্দোলনকারীরা ছিলেন বিচ্ছিন্ন। কোনরূপ পরিকল্পনা বা জাতীয় নেতৃত্ব দ্বারা আন্দোলন চালিত হয়নি। তাই ড. *মজুমদার*-এর মতে, '১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহকে কোনরূপ জাতীয় চরিত্র দেওয়া সংগত নয়।' তাঁর ভাষায়: *"It is difficult to avoid the conclusion that the so called First National war of Independence of 1857 is neither the First, not National nor a war of independence."*। অর্থাৎ "এটি ছিল ক্ষয়িষ্ণু অভিজাতশ্রেণীর আর্তনাদ।"

সংশোধনী ছাড়াই ড. মজুমদারের মন্তব্য মেনে নেওয়া যায় না। তিনি যে মানদণ্ডের ভিত্তিতে এই আন্দোলনকে জাতীয় আন্দোলন বলতে অস্বীকার করেছেন, তা অনেকের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। ড. সুশোভনচন্দ্র সরকারের মতে, উদারতাবাদ বা গণতন্ত্রবাদের ধারণা ছিল খুবই অস্পষ্ট এবং সেটাই স্বাভাবিক। শুধু এই কারণে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের আন্দোলনকে সংকীর্ণ, বিচ্ছিন্ন, প্রতিক্রিয়াশীল ইত্যাদি বলা যায় না। ড. সরকার দৃঢ়তার সাথে বলেছেন যে, এই আন্দোলনে যোগদানকারী সাধারণ মানুষ বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়েছিল। বাহাদুর শাহকে ভারত সম্রাটরূপে গ্রহণ করে বিদ্রোহীরা হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। 'আজমগড় ঘোষণাপত্রে' সর্বশ্রেণীর মানুষকে আহ্বান জানানো হয়েছিল বিদেশী ইংরেজের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য। বিদ্রোহীদের মধ্যে "জাতীয় রাষ্ট্রের" ধারণা হয়তো ছিল না; কিন্তু জাতীয়তাবোধ ছিল। তাই একে 'জাতীয় সংগ্রাম' বলা যেতে পারে। 'ভারত থেকে প্রেরিত সংবাদ' প্রবন্ধে ***কার্ল মার্কস*** জাতী-ধর্ম নির্বিশেষে ভারতবাসীর ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম হিসেবে মহাবিদ্রোহকে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি লিখেছেন: 'ব্রিটিশ শাসক যাকে সামরিক বিদ্রোহ ভাবছে, সেটা আসলে একটি জাতীয় বিদ্রোহ।' ***সুপ্রকাশ রায়*** লিখেছেন: 'যে সংগ্রামের মূল শক্তি শতাব্দীকাল ব্যাপী শোষণ-উৎপীড়নে জর্জরিত; ভূমিহীন ও গৃহহীন কৃষক জনসাধারণ, সেই সংগ্রামকে 'প্রতিক্রিয়াশীল' বলে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা কেবল অজ্ঞতাপ্রসূত নয়, উদ্দেশ্যমূলক।" তাঁর মতে, কংগ্রেস পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনের তুলনায় ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহে অনেক বেশি কৃষক অংশ নিয়েছিল।

টমাস মেটকাফের সাম্প্রতিক গ্রন্থ *"The After math of Revolt: India'* তে এই মতের বিরূপ সমালোচনা পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন যে, 'এই বিদ্রোহ কোন কোন ক্ষেত্রে সিপাহি বিদ্রোহকে ছাপিয়ে গেলেও, কখনওই জাতীয় বিদ্রোহের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারেনি। মেটকাফের মতে বিদ্রোহের নেতারা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হতাশাজনকভাবেই একে অপরের বিরোধী ছিলেন। তিনি লিখেছেন বিদ্রোহের নেতারা "যদি একত্রিত হয়ে পরাজিত হয়ে থাকে, তবে বিজয়ী হলে তারা একে অপরের গলা কাটত।" ***জুডিথ ব্রাউন*** দেখিয়েছেন যে পাঞ্জাবি রাজপুরুষরা হিন্দুস্তানী সেনাদের আদৌ পছন্দ করত না। এমনকি মুঘল সাম্রাজ্যের পুনরুত্থান তাদের কাম্য ছিল না।[1] *New Cambridge History of India (ii)* তে ***বেইলি*** (C. A. Bayly) মন্তব্য করেছেন যে, বিদ্রোহীদের বিভিন্ন অংশের উদ্দেশ্য ছিল স্বতন্ত্র। ফলে তাদের নিজেদের মধ্যে অন্তর্বিরোধ ছিল তীব্র।

জাত্যাভিমানে আকীর্ণ ইংরেজ লেখকগণের মূল্যায়ন কিংবা 'জাতীয়তাবাদ' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও বৈশিষ্ট্যের অনুসন্ধানী ভারতীয় পণ্ডিতদের ব্যাখ্যা ১৮৫৭-র বিদ্রোহের স্বরূপ অনুধাবনের পক্ষে এককভাবে যথেষ্ট নয়। এ কথা ঠিক যে, আধুনিক অর্থে ভারতীয় জাতির ধারণা বিদ্রোহীদের ছিল না। বিদ্রোহী গ্রামীণ জনতার কাজ বহুলাংশেই ছিল স্থানীয়। তথাপি ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহ পূর্বেকার কৃষক বিদ্রোহগুলি থেকে স্বতন্ত্র ছিল।

---

1. J. Brown - Modern India : The Origins of an Asian Democracy (1994) P. 90.

Scanned by CamScanner

শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় *From plassey to Partition* গ্রন্থে লিখেছেন যে, এই বিদ্রোহে উত্তর ও মধ্য ভারতের বিদ্রোহী কৃষকদের মধ্যে সমন্বয় ও যোগাযোগ ছিল। নানারকম গুজব ও ভীতি তাদের অদৃশ্য বন্ধনে আবদ্ধ রেখেছিল। অধ্যাপক বুদ্রাংশু মুখোপাধ্যায়ের মূল্যায়নেও গণজাগরণের তত্ত্ব সমর্থিত হয়।[2] জুডিথ ব্রাউন এবং এরিক স্টোকস্ ১৮৫৭-র বিদ্রোহকে মূলত সামন্তশ্রেণীর নেতৃত্বে সংঘটিত উচ্চকোটীর মানুষের আন্দোলন বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় দেখিয়েছেন যে, এটাই বিদ্রোহের সম্পূর্ণ ছবি নয়। বিদ্রোহের বহু ক্ষেত্রেই জনতা নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়েছিল। বাহাদুর শাহ বা তাঁতিয়া তোপি অনেকটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিদ্রোহী সিপাহিদের চাপেই নেতৃত্ব দিতে রাজি হয়েছিলেন। অযোধ্যায় ক্ষেত্রে দেখা যায় বহু তালুকদার ইংরেজের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন, কেউ কেউ মাঝপথে পক্ষত্যাগ করে সরকারের প্রতি আনুগত্য দেখিয়েছিলেন। বিদ্রোহের উদ্যোগ বহুক্ষেত্রেই এসেছিল ভারতীয় গ্রামীণ কৃষক ও কারিগরদের পক্ষ থেকে। বিদ্রোহের মূল উদ্যোক্তা সিপাহিরা ছিল 'উর্দিপরা কৃষক'। বিদ্রোহের মাঝপথে এরা উর্দি ছেড়ে কৃষকদের সাথেই মিশে গিয়েছিল। ড. রণজিৎ গুহের মতে, কৃষকদের অস্ত্রধারণের লক্ষ্য ছিল পূর্বপুরুষের 'শাসনক্ষেত্র' দখল করা।[1] এই শাসনক্ষেত্র বলতে বিদ্রোহীরা সতেরো শতকের কেন্দ্রীভূত রাজনৈতিক বিন্যাস, যেখানে একাধিক স্বশাসিত আঞ্চলিক কর্তৃত্ব ও মুঘল সম্রাটের সহাবস্থান থাকবে। অধ্যাপক রজতকান্ত রায় 'এরিক স্টোক্স' স্মারক গ্রন্থে ১৮৫৭-র আন্দোলনে হিন্দু-মুসলমানের ভারতবোধের প্রশংসা করেছেন। বেইলি (C. A. Baylee) লিখেছেন যে, বিদ্রোহীদের লক্ষ্য ছিল "মুঘল বৈধতার বৃহত্তর পরিমণ্ডলে ইন্দো-মুঘল দেশীয় রাজ্যগুলির পুনঃপ্রতিষ্ঠা, যেখানে জমি ও জনগণের মধ্যে একটা সমতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার সম্পর্ক বজায় থাকবে।" ড. শেখর বন্দোপাধ্যায়ের মতে, "১৮৫৭-৫৮ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষে বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে আপত্তি ও অসন্তোষের স্বর শোনা গিয়েছিল, যদিও তা উদাত্ত কণ্ঠে মুক্তির আহ্বান ছিল না।"

তাই এই আন্দোলনকে জাতীয় বিদ্রোহ না-বলার কোন যুক্তি নেই। ব্রিটিশ-নেতা ডিজরেলী স্বয়ং ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ঘোষণা করেছিলেন যে, এটি সাধারণ সিপাহিদের অভ্যুত্থান নয়, এটি একটি জাতীয় আন্দোলন, সিপাহিরা সেই সংগ্রামের হাতিয়ার মাত্র। ড. সেন আন্দোলনের ব্যাপকতা স্বীকার করেও এটিকে 'প্রতিবিপ্লব' আখ্যা দিয়েছেন। মনে রাখা দরকার যে, আন্দোলন ধ্বনিত হয়েছিল শোষণের বিরুদ্ধে। আর মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-কাঠামোয় যে-কোন আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ভূস্বামীশ্রেণীর নেতৃত্ব থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু এই কারণে আন্দোলনকে 'প্রগতিবিরোধী' বলা অযৌক্তিক। যেসব বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর অভাবহেতু ড. মজুমদার মহাবিদ্রোহকে জাতীয় আন্দোলন বলতে অস্বীকার করেছেন, বিশ্বের বহু গণজাগরণে সেইসব গুণাবলীর অভাব ছিল। যেমন— ইতালির 'কার্বোনারী' আন্দোলন, বোনাপার্টের বিরুদ্ধে 'স্পেনীয় জুনটার আন্দোলন' বা 'পোল্যান্ডের বিদ্রোহ' ইত্যাদি। কিন্তু এই সকল আন্দোলন জাতীয় আন্দোলন হিসেবেই ইতিহাসে স্বীকৃত। অথচ ভারতবাসীর আন্দোলনকে জাতীয় মর্যাদা দিতে আমরা দ্বিধাগ্রস্ত। ড. সুশোভনচন্দ্র সরকার যথার্থই লিখেছেন যে, যাঁরা মারাঠা জাতীয়তাবাদ, রাজপুত জাতীয়তাবাদ ইত্যাদির কথা তুলে গর্ব অনুভব করেন, তাঁরা কেন ১৮৫৭-র বিদ্রোহকে জাতীয় আন্দোলন বলতে দ্বিধাগ্রস্ত তা বুদ্ধির অগম্য। তাই বলা চলে, বীর সাভারকারের ভাষায় এটিকে 'ভারতের প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ' বলা যেমন অতিশয়োক্তি, তেমনি এই আন্দোলনের মধ্যে আদৌ জাতীয়তাবোধ খুঁজে না-পাওয়াও সত্যকে অস্বীকার করা।

মহাবিদ্রোহের গুরুত্ব ও ফলাফল :

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতবাসীর মহাবিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছিল; তবে তা সম্পূর্ণ নিষ্ফলা ছিল না। এই

---

2. *R. Mukherjee - Awadh in Revolt ; A study of Popular resistance (1998) P.62-63.*

1. *Guha - Elementary A spects of Peasant Insurgency in Colonial India (1994) P-318*

Scanned by CamScanner